বাজার বৃত্তান্ত

সাধন চট্টোপাধ্যায়

বাজারে গিয়ে জানতে পারলাম, আজই টাটকা ভোরে সে মারা গেছে। গ্রাম থেকে যারা আসে, একজন তাদের খবরটি দিয়েছিল।

আমার একটা চিঠি আদ্দেক লেখা অবস্থায় ছিল। সম্পাদকের উদ্দেশে। গত রাতেও ভেবেছিলাম শেষ করে পাদিয়ে দেই। হয়ে ওঠেনি। তাই আজ বাজার ফেরত টিফিন-টিপিন খেয়ে, বাকি কয়েকটা বাক্য জুড়ে দিয়ে ডাকবাক্সে ফেলে দিলাম।

মান্যবরেষু,

সেই একবছর আগে, ফের এবার। লেখার অনুরোধ পাঠান, পারবনা-পারবনা করেও শেষমেষ লিখি। আপনার সঙ্গে সম্পর্কটা আর আনুষ্ঠানিকতায় বদ্ধ নয়। প্রায় এক যুগ হতে চল্ল, তাই না? সম্পর্কটা এখন লেখক-সম্পাদকের নিছকতার বাইরে কিছু দাঁড়িয়ে গেছে। অকপটে দাবি জানাতে পারি, কৈ, এবারের পুজোর চিঠি পাঠান নি কেন? আপনিও চটপট হেসে জবাব দিতে পারেন, এতো পাকাপাকি চুক্তি! না-ই বা গেল চিঠি!

তবু চিঠি আসে, আপনার ফোনও। কোনোদিন মুখফুটে বলেন না, তবু আমার গল্পের উৎকর্ষের ওপর আপনার নীরব আস্থা উভয়ের সম্পর্কটিকে মজবুত করে তুলেছে।

আপনার চিঠির বয়ানটি ভারি মজার। সংক্ষিপ্ত। সংশোধনের পরই বড় বড় অক্ষরে একটি মাত্র শব্দ 'গল্প'! নিচে দুর্বোধ্য হস্তাক্ষরে আপনার সইটি। পেয়েই মুচকি হেসে ড্রয়ারে ফেলে দিয়ে, ক্যালেন্ডারে ছক কষি, কতদূর সময়টুকু টেনে নিলে, সম্পর্ক শিষ্টাচারের মধ্যে থাকে। ফোনে দু-চারবার গুঁতো এলে, তবেই নড়েচড়ে বসি। ব্যাপারটা এভাবেই চলছিল।

এবারের চিঠি পেয়ে মনের বেসুরো তারটি বেজে উঠল। বয়ান প্রতিবছরের মতোই। এ বছর কেবল 'গল্প' শব্দটির আগে 'ভালো' বিশেষণটি বসিয়ে দিয়েছেন। সূক্ষ্ম হোঁচট খেলাম। গড়া ভাবমূর্ত্তির সৌধ থেকে একটি খণ্ড পাথর খসে পড়ল যেন। বুঝলাম, গত বছরের গল্পটি আপনাকে খুশি করতে পারেনি। গড়পড়তা লেখা হয়েছে। খাতিরে ছাপিয়েছিলেন। একবছর ধরে নীরব থেকেছেন, কোনো উচ্চ-বাচ্য করেননি। অনেকটাই যেন ভদ্র সামাজিকতা। একজন স্রষ্টার পক্ষে এটুকু যেন কত গভীর গ্লানির—অন্যকে বোঝানো দুরুহ। এ-আত্মদহন চুপচাপ নিজেকেই বইতে হয়।

আপনার পত্রিকায় কী লিখেছিলাম ও-বছর? প্রতি শারদে দশ -বারোটি গল্প লেখার দাবি মেটাতে হয়। পত্রিকা ধরে ধরে গল্পের নাম, বিষয়বস্তু এ-বয়সে আর স্মরণে থাকে না। ছোকরা বয়সে স্বপ্নে উত্তেজনায় মনে রাখতে পারতাম। এখন ধাতস্থ হয়ে গেছি। জানি, ঘনিষ্ঠ দু-চারজন জানাবে অমুক গল্পটি দারুন হয়েছে! বাকিগুলোর সম্পর্কে কোনো মতামত পাব না। মতামতহীনতা রহস্যময় দেয়ালের মত দাঁড়িয়ে থাকবে। তাতেই আজকাল আন্দাজ করে নেই, গল্পগুলো লিখে আমার সুনাম ক্ষুন্ন হয়নি। তালে, টের পেতাম নিন্দুকদের উল্লাস। যা-তা! ট্র্যা-শ! কেন লিখছেন আর? থামতে বলুন!

কী গল্প লিখেছিলাম আপনার পত্রিকায়। যার জন্য আপনার মতো কৃপণ বাক্য খরচকারী 'ভালো' শব্দটি যোগ করলেন? চোখ বুলিয়ে দেখলাম, এ তো মুকেশ আমবানিকে নিয়ে ছিল গল্পটি! তিনিতো হেজিপেজি নন। দেশের সাধারণ জন্তার মধ্যে পড়েন না। দেশের তো বটেই, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ধনীদের অন্যতম।

আমি পাঠকরুচির মার্কেট সার্ভে করি। কী চায়, কী খায়— সর্বাধুনিক সংবাদ অজানা থাকলে গল্পের বিষয় বস্তাপচা, ভ্যাদভ্যাদে লাগবে পাঠকদের কাছে। আমার বিশ্বাস, বিশ্বায়ণের ঝাঁ-চকচকে পরিবেশে, পাঠকরা আর সাধারণ, কমন্‌ম্যানদের দুঃখ-দুদ্দশা পড়তে চায় না। প্যানপ্যানানি আ-র ভাল্লাগে না। সারা দিনের হাড়ভাঙা প্রতিযোগিতার পর সামান্য বিনোদন না থাকলে চলে! এ দিল মাঙে মোর!

তাইতো আমবানিদের কথা এনেছিলাম। তাও খেলো না? ধন্ধে পড়লাম। তবে গল্পটিতে মুকেশ আমবানির ব্যক্তিগত কেচ্ছাকাহিনির বা যৌনতার (আছে কিনা জানিনা) সাতকাহন ছিল না। আমাকে তিনি যে-ছড়াটা শুনিয়েছিলেন, তা নিয়েই গল্পের মূল বিষয়।

উনি পুরনো একটা ভাঙা সাইকেলে চেপে রোজ আমাদের বাজারটিতে বসতেন। নানা সিজ্‌নে, নানা কারবার নিয়ে। কোন কোন ঋতুতে থাকত নানা ধরণের বীজ। মুলো, ডেঙো ডাঁটা, লাউ, ঝিঙে, উচ্ছে ইত্যাদি, সঙ্গে থাকত লঙ্কা, বেগুন, টমেটোর চারা। বাকি সময়ে কখনো চাষের ট্যাঁড়শ, টমেটো, আলু, নটেশাক, সিম-বরবটি বা ঘোর বর্ষার দিনে বড় বড় মানকচুর পাতায় নিয়ে বসতেন পুঁটি-ল্যাটা-ট্যাংরা-কই নিয়ে। মাঠঘাট-জলা তখন ছপিয়ে যেতো কিনা।

গত সনের গল্পে অবিশ্যি এ-সব প্রায় তেমন জুড়ে ছিল না। ছড়াটাই ছিল আখ্যানের মুখ্য বিষয়। ওদের সঙ্গে আমার আলাপ ও ঘনিষ্ঠতা জন্মেছিল কথা কাটাকাটির মধ্য দিয়ে।

তখনও জানতাম না মানুষটি পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধনী। চেহারাটা গিলগিলে ধরণের, চামড়ায় বছরজুড়েই খড়ি ওঠা। প্যাতা-প্যাতা, লালচে ফেসো আলুঝালু চুল। কণ্ঠে তুলসীকাঠের মালা। ঠ্যাং উচিয়ে উবু হয়ে বসে থাকতেন, আর চারপাশে ঘনঘন খৈনি থুথু পিচকোতেন। কথাবার্তায় পালিশ থাকত না। বড্ড খরখরে এবং মেজাজি। মুখটা লম্বা শেয়ালপানা ধরনের। গাঁজা ফুঁকে ফুঁকে চাউনি ঘোর।

সেবার ফাগুন কি চোত মাস হবে, এক থলি কাঁচা আম সাজিয়ে বসেছিলেন। রোদ চনমন কচ্ছিল চারদিকে। এ-সময়ে আমাদের টক খাওয়ার সাধ হয়। বাছতে বসে গেলাম। দেখি, বেশ কয়েকটা অংশত সিঁদুর গোছের লালিয়ে উঠেছে। বেশ লাগছে দেখতে! বল্লাম এগুলো কী আম? পেকে উঠেছে? উনি গম্ভীরসে জবাব দিলেন, কোকিলপাদা!

—মানে?

আমার জিজ্ঞাসু চোখে চোখ তুলে বল্লেন, কোকিল ওর শরীলে পেদে দিয়েচে। সিদুরবন্ন এমনি এমনি হয় না।

—তার জন্য এত দাম?

আমার যুক্তিতে গ্যাঁজারুর গোঁগ নিয়ে বল্লেন, হ্যাঁ মশায়! বেশি দাম হবে না?

সহজ হিসেবে বল্লাম, কেন হবে? গাছে আমও থাকে, কোকিলও উড়ে বেড়ায়—ক্রাইসিস্‌টা কোথায়?

মুখেশজি উন্নাসিকের মতো বল্লেন, যান! যান! কোকিল ধরুন, আম কিনুন—পাদিয়ে খান গা তবে!

কান ঝাঁ ঝাঁ করতেই, খেপে উঠেছিলাম। উল্টো ফুটের একজন বাজারি খুকখুক হাসছিল। হাত তুলে ডেকে নিয়ে বল্লেন, আস্ত ছোটলোক!...যাবেন না ওর কাচে!

আমি জানি ছোটলোক-ভদ্দলোকের মাপকাঠি। মুখের নোংরা বুলি, পোশাক নাকি হৃদয়ের অন্তঃস্থলে ইতর-ভদ্রতার সম্পর্কে পরীক্ষা—বিশ্বাসটুকু যার যার মতো। এ-ভাবেই নরমে-গরমে মুকেশজির সঙ্গে আমার আলাপ। ধীরে ধীরে তা সহজ ও ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। উনি পেছনে লাগতেন আমার, আমিও খেপিয়ে মজা পেতুম। তবে সবকিছুই ছিল পরিমিত, শালীনতার লক্ষণরেখার মধ্যে। যতই হোক না কিছু, উনি জগৎখ্যাত একজন ধনী ব্যক্তি। আমি ফুটো মস্তান, মধ্যবিত্ত ভদ্দরলোক একজন। তবে আশপাশের কিছু বাজারি ফাঁক পেলেই কিছু ছুঁড়ে পারত। একটু মজা। পচা বেগুন, ভালা পটল, ঝিঙের টুকরো বা টমেটো। উনি চুপচাব সব গুছিয়ে সাজিয়ে সাক্ষিরাখতেন। সক্কলকে শুনিয়ে মাঝেমধ্যে এমন গাল পাড়তেন—কানে আঙ্গুল দিতে হত। এভাবেই ওঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা।

একদিন খুঁজে খুঁজে ওনার বাড়ি গেলাম। শুনেছিলাম কোটি কোটি টাকার, সাতাশ তলা উঁচু মেঘের রাজ্যে নাকি বাড়িটি। চাকরবাকরই নাকি দুইশত। না হোক, কুড়ি জন তো হবেই।

বাড়িতে অনেক গল্প করলেন আমার সঙ্গে। শেষে, আপন চাষের কড়াইশুঁটি ভেজে, মুড়ির সঙ্গে খাওয়ালেন। ইন্টারকম্‌ টিপে বউকে ডাকা করালেন, লিফ্‌ট বেয়ে নেমে বউটি একঝলক সৌজন্য বিনিময় করে গেল। আবলুশ কাঠের মতো কালো রং, দাঁত উঁচু, মাঝকপালে সিঁদূর ডগ্‌ডগ্‌ করছে। মাথায় শুকনো ঝোপের মতো রুক্ষ চুল।

এভাবেই কয়েকটা বছর মুকেশজির সঙ্গে নরমে-গরমে আমার বাজারদর্পণ চলছিল। সুখদুঃখের অনেক কথা। হঠাৎ শুনতে পেলাম, পুরো বাজারটাই আর এমন ব্যবস্থায় থাকবে না। অতি দরিদ্র এক অভাজন ভুজঙ্গ মাইতি নামে, পুরো বাজারটাই কিনে নিচ্ছেন। মস্ত বড় বড় শো-রুমের মতো উঁচু উঁচু গুদাম গজিয়ে উঠবে। ভুজঙ্গ মাইতি নাকি দিন আনে দিন খায়, থাকে চারমাইল ভেতরে বোঁদাই গ্রামে।

—কিনে নেবে বাজারটা? তালে? আমাদের কী হবে?

—কি আর হবে! আমদের লাভ হবে!

—মানে?

ফোড়ের দালালি থাকবে না! চাষি সরাসরি শো-রুমে খেতের আনাজ বেচে নগদা বিদায় পেয়ে ফিরে যাবে। সময়টাও বাঁচল তাদের। খদ্দেররা সস্তায় আনাজপাতি কিনতে পারবে। শোনা যাচ্ছে, ভুজঙ্গ মাইতি এক লপ্তে মাঠকে মাঠ ফসল দাদনে কিনে নেবে। খরা-বন্যায় মূল্যের হেরফেরের ঝুঁকি ভুজঙ্গের। চাষিদের কোনো ঝুঁকি নেই, খদ্দেরেরও বাড়তি দামের কৈফিয়ৎ শুনতে হবে না। —বাজারে যারা এসে বসত রোজ রোজ ?

—দরকার নেই তাদের! ক্রেতারাতো ঝিঙে পটল, মায় টক খাওয়ার আমড়াটি পর্যন্ত শো-রুমে পেয়ে যাবেন!

—তোবা! তোবা! আমি বললাম শুনে। তখনই মুকেশজির ছড়াটি মনে পড়ল তিনি একদিন যা আমায় শুনিয়েছিলেন।

সে-বছর খরার লক্ষণ ছিল দেশজুড়ে। জষ্টি শেষ হয় হয় —তবু ছিটেফোঁটা ঝরছিল না। আমার আসলে স্বভাবে দেরি করে বাজার ঢোকার অভ্যেস। কোনো কোনো দিন বাজার পৌঁছতে এগারোটাও বেজে যায়। তখন শো-রুম তৈরি নিয়ে নানা মুনি নানা মত দিচ্ছিল। তক্কের শেষ নেই, বাজারে মিলছিল না কিছু। যে-টুকু আসে, সকাল-সকাল খদ্দেররা টেনে নিয়ে যায়। প্রায়ই লক্ষ্য করি, বেচেটেচে অনেকেই চলে গেছে, জায়গাগুলো তাদের ফাঁকা। দু-চারজন উঠি উঠি করছে—ঘাটাঘাটির কিছু শাকপাতা সব্জি পড়ে আছে। মুকেশজির সঙ্গে দেখাই হয় না। শুনি সকাল সকাল বেচে দিয়ে, বা পাইকারকে গছিয়ে চলে গেছেন। একদিন অকস্মাৎ দেখা হয়ে গেল। দেখি, ভাঙা সাইকেলের পেছন - ক্যারিযারে থলি, প্ল্যাস্টিক শিট্‌ বাঁধছেন। দাঁতে চেপে রেখেছেন একমুখ খৈনির থুথু। হেসে অনুযোগ করলাম, আজকাল কিছুই আনছেন না দেখছি! মুকেশজি পুচ্‌ করে মুখটা ফাঁক করলেন। কালচে কুয়াশা রংঙের দাঁতগুলো দেখতে পেলাম। নির্মল হাসি দিয়ে বল্লেন, মাঝ রাতে হৈ চৈ/ খাও ভোয়া ধানের খৈ!

—কী বল্লেন? বলুন ফের! আমি উৎসাহ দেখাতে, সাইকেল ঠেলে নিয়ে ফের, দুবার খায় না! পরের অনুরোধটুকুও ফিরিয়ে দিলেন। অগত্যা, বাবার আউড়ে ছড়াটা মুখস্ত করলাম। সত্যিই, বেলা এগারটা—বাজারের এখন মাঝরাত। সকাল আটটা-নটাতেই মাল সব বিকিয়ে গিয়ে সন্ধে। চিটে ধানের খৈ ছাড়া কীইবা মিলতে পারে।

শুনে ভারি মজা লাগল। এটা বাড়তি পাওনা হল। ফোড়েহীন, ভুজঙ্গ মাইতির বাতানুকুল ঘরে ঘরে টাটকা সব্জি যখন - তখন সস্তায় মিললেও, এ-সব অতিরিক্ত হিসেবে পাওয়া যাবে না কিছু। গত বছর, আপনার পত্রিকায় আমার গল্পটার এই ছিল বলার কথা। জীবন্ত বাজারে ক্রেতা-বিক্রেতার সংসারে, মানুষের কিছু ভাষা ও আবেগের আদান প্রদানের কথা।

পাঠকবৃন্দ তা নেয়নি। টের পাচ্ছি, এক বছরেই তাদের রুচিতে ফের উজোন বইছে। তারা আর বিনোদনের জন্য ধনীদের কাহিনি - কেচ্ছায় আগ্রহী নয়। সিনেমা, ভিডিও বা সিরিয়ালে ওসব রোজ দেখছে। ক্লান্ত। এখন ফের গরীব দেশবাসীর দুঃখু, কান্না, ফ্যাচফ্যাচানি খুব খাচ্ছে হয়তো। খুন, ধর্ষণ, ভ্রষ্টাচারের রাজনীতির রোমহর্ষক কেচ্ছার দায়িত্ব নিয়েছে খবরের কাগজগুলো। তাই, গল্প-উপন্যাসের খাদ্য হিসেবে

গবীরদের ঘরে ঢোকা ছাড়া উপায় দেখছিনে।

তাই ঠিক করলাম, এ-পুজোয় আপনার পত্রিকায়, গবীর ভুজঙ্গ মাইতির কথা লিখব—যার শো-রুমগুলো খুচরো ব্যবসায়ে বিদেশী বিনিয়োগ আইনটি লাগু হলেই রমরম করে উঠবে। শুনেছি, গরীব এই ভদ্রলোকটি গাঁয়ে নতুন এক্সপ্রেস রাস্তা হলেই দুপাশের জমি হাঁ করে গিলে ফেলেছেন। জমিনীতি এখনও ঝুলে আছে, তবু ঝুঁকি নিয়ে বসেছেন ভুজঙ্গ মাইতি। তিনি ধাম্মিক মানুষ। মনে করছেন, জীবনের লাভ লোকসান সব ওপরওয়ালার হাত। ফলের আশায় না থেকে কর্ম করে যেতে হবে। স্বপ্ন বানাতে হবে। শুনেছি মানুষটি তাঁর স্বপ্নগুলো ঈশ্বরের কাছে নিবেদন করেন। শুধু দুপাশের লপ্তে লপ্তে ক্ষেত - জমিই নয়, আস্ত নদী-জল-পাহাড়-জঙ্গল-খনি থেকে সসাগরা এই দেশটিই কিনে নিয়ে জগৎবাসীকে কৃতার্থ করতে চান। ফেরুলের বাজারটুকুতো তাঁর হাতের ময়লারও অধম। এমনকি পাতালের বলি রাজার তেল-গ্যাস-ধাতু সকলকে আর অজানা-অচেনা রাখতে চান না। একদিন মুকেশজি গুদোম ঘরগুলোর দিকে হাঁ-পিত্যেশ তাকিয়ে ফোঁটা ফোঁটা চোখের জলে দুঃখু করছিলেন, আপনাদের কী।... ঠান্ডা ঘরে ঢুকে দরদাম করবেন... আমরা বাইরে ডাঁইরে রোদ জলে সেলাম ঠুকব, বুইলেন বাবু!

তো, বিস্ময়ের করীব সেই ভুজঙ্গ মাইতির মুখোমুখি হয়ে গেলাম একদিন। অভাবিত পরিবেশে। আমাদের পরিবারের গুরু-মার আশ্রমে এক শিষ্যা তার স্বামীর মৃত্যুতিথিতে সেবা দিয়েছে, প্রসাদ নিতে গেছি। গুরু -বাবার পান-বিড়ির দোকান ছিল। বহু কষ্টে ভক্তদের কাছে ভিক্ষে করে, ভাগিরথীর তীরে ছোট্ট একটু আশ্রম গড়েছিলেন। টিন আর পাঁচ ইঞ্চি ইটের গাঁথনি। কোনক্রমে দরজা-জানলাও লাগানো হয়েছিল। গুরু-বাবা সংসারের অনটনে শান্ত এই পরিবেশে উঠে এলেন চব্বিশ ঘন্টা ভক্ত সমাগম শুরু হল। দু-চারজন পয়সাওয়ালা ভক্তও ভিড়ল সেখানে। কিন্তু কপালে সইল না। মশার কামড়ে আচমকা দিন দুই হাসপাতালে ভুগে চোখ বুজলেন গুরুদেব। দশকাটা জায়গা, পাকা আশ্রয়, কলাটা মুলোটা চাষ হয়। ছাগল আছে। কেউ না দেখলে তো ভূতে খাবে। শেষে গুরুমা চলে এলেন সংসার ছেড়ে। বউদের ঝাঁটার হাত থেকেও রেহাই হল। তখন গুরমাকে ঘিরে ফের আশ্রমের ছিরিছাঁদ ফিরতে শুরু করল।

বর্ষাকাল। গোটা কয়েক পাকা তাল থলিতে নিয়ে গুরুমার কাছে হাজির হলাম। ভাতের সুগন্ধ ছুটছে। মুগের ডাল, বেগুন ভাজা, তরকারির লাবরা, একটুকরো মাছ আর আমড়ার টক দিয়ে ভক্তরা সেবা পাবে। এখন ঘরের মধ্যে চলছে নামকেত্তন। টিটিংটিং—খোল বাজছে আর নামগান। গুরুমা তাল পেয়ে খুশি। টানতে টানতে ঘরে মধ্যে একজনার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে বল্লেন, বাবা ভুজঙ্গ, ইনি ননীগোপাল, সেবার জন্য তাল এনেচে। একটু তেল জোগাড় হলে, ত্যানার কিরপায় পাতে সবার তালবড়া পড়ত! দেকি মা, হবে খন বলে লোকটি খোল থামিয়ে দুহাত কপালে জুড়ে পেন্নাম করলে আমায়। দোহারা লম্বা চেহারা, মাথা নেড়া, তুলসী কাঠের মালা, গোল গলার ময়লা একটা গেঞ্জি পরা আর না-কাচা নতুন-কোড় ধুতি। মুখে কোনো চর্বি নেই, হাড়গুলো নিরস কটকঠ করছে।

মাথায় বাবরি চুলের ধাঁচ, কালো বর্ণের কপালে চন্দনের শুকনো তিলক। জয়গুরু! কোতা থেকে আগমন হয়েচে? হেসে বললাম, ফেরুলে গাঁয়ে থাকি। উনি হাসি ছড়িয়ে বল্লেন, ফেরুলে আর গাঁ নেই— শহর! বল্লাম, আপনি?...আপনার চেয়ে উত্তরে দু কোশ ভেতরে!

—আপনিই কি ফেরুলে বাজারে শো-রুম কচ্চেন?

উনি মৃদু লজ্জিত হয়ে বল্লেন, সব ওপরঅলা!...আমি কিছু নই ভাই!

নিয়ে বসলেন নিজের পাশে। বিড়ি সেবা করালেন। তারপর খোলটি আমার গলায় ঝুলিয়ে দিয়ে, কর্তাল নিয়ে ভক্তিতে ভেসে গেলেন। অল্প সময়তেই বড্ড আপন করে নিলেন আমায়। এরই মধ্যে তেল জোগাড়ে বেরুলেন, কলাপাতা কেটে আনলেন, ফের এসে নেচেনেচে নামগানে ধুয়ো ধরলেন—চরকির মতো ঘুরছেনই।

আমাকে পাশে নিয়ে সেবা করলেন। আহাঃ! চরম তৃপ্তিতে একটুকরো মাছ নিয়ে, কি আনন্দ। যেন স্বর্গের স্বাদ পাচ্ছেন। গরম ভাতে গত্ত বানিয়ে ডাল নিলেন, খানিকটা লাবরা, একটু বাড়তি আমড়ার টকের জন কী আকুতি। পরিতৃপ্তির হাসির মধ্যেই বুঝিয়ে দিলেন জঠরাগ্নি কাকে বলে!

বিকেলে জানালেন, পায়ের ধুলো দেবেন ভাই বোঁদাই গেলে! বল্লাম, ফেরুলে বাজারে তদারকিতে কি রোজ আসেন? শুনে অতি বিনয়ে জানালেন, ঠাকুরের ইচ্ছে হলে যাই... যেতে হয়...তবে তদারকির লোক আছে। গুরুমার মুখে শুনলাম, গ্রাম -গাঁর দিকে ঘুরতে আপনি ভালোবাসেন, বোঁদাই গেলে পায়ের ধুলো দিবেন!

অমি হেসে বল্লাম, ফেরুলে বাজারে যা পেল্লাই গুদোম হচ্ছে, ক্রেতা হিসেবে কি জায়গা হবে আমাদের!

ভুজঙ্গ মাইতি এক বিঘত জিভ বার করে বল্লেন, ননীগোপাল বাবু, ক্রেতা বাণিজ্যের লক্ষ্মী! অমন কথা কইতে নেই!

বাজারে দেখলাম সব্বাই ভুজঙ্গকে চেনে। ভুজু-ভজুয়া-ভউজ্জা বলে ব্যঙ্গ করে। একদিন বোঁদাইয়ের পথে যেতে ভুজঙ্গর কথা মনে পড়ল। গিয়ে উপস্থিত হলাম। বর্ষার ঘা খাওয়া মাটির ঘর, উঁচু দাওয়া। হলে কি হবে, বাড়ির ভেতর কোটি কোটি টাকার ক্রুকারিজ। খাঁটি সব জাপানি মাল। দুটি মেয়ের বিয়ে হয়ে গিয়েছে। সোমত্ত একটি ছেলে এবার উচ্চমাধ্যমিকে ব্যাক্ পেয়েছে। দেখলাম ভুজঙ্গর প্রাণী পোষার শখ। বেজি, চন্দনা, টার্কিস মুরগি—দু দুটি ছাগলের বেশ আদর যত্ন করে।

বউটিকে দেখে অবাক। কী চোখ, কী ধপধপে উজ্জ্বল ত্বক—যেন লক্ষ টাকার বিদেশী প্রসাধন না মাখলে দিন চলে না। সন্ধ্যায় সেদিন, কেরোসিনের টেমি জ্বেলে দাওয়ায় বসাল। বাড়িতে আলো এসেছে কিন্তু লোডশোডিং। আসন বিছিয়ে দিয়ে, ধবধবে পাতলা চায়না বোলের পাত্রে খানিকটা চালভাজা খেতে দিল। ভুজঙ্গ মাইতিরও পেট চোঁ চোঁ করছিল। সারাদিন জল-মাটি-নদী-জঙ্গল-খনি আগলাবার নেশায়! তাঁতে পিশে কড়মড় করে চালভাজা চিবোতে লাগলেন! আশ মিটিয়ে জল খেয়ে উদগার তুললেন শেষে। শেষে বল্লেন রাতের সেবা হইয়ে গেল! বারান্দার কোণ থেকে বহু পুরনো মৃদঙ্গটি নামিয়ে এনে বল্লেন, এট্টু নামগান হোক। আমি পৌঁছে দিবনে বড় রাস্তায়। হাতে হারিকেন ঝুলিয়ে রাত নটায় দেড় মাইল দূরের বাস রাস্তায় তুলে দিয়ে গেছেলেন।

এ-ভাবে সম্পর্কে জড়িয়ে গেলাম। এখন তো ফেরুলে বাজার পুরনো প্রথায় নেই। হাজার হাজার মন শাক-সব্জি আনাজ আলু লরি-টেম্পো-ম্যাটাডোর বা ছোট ছোট মটোর লাগানো কাঠের ভ্যানে ভুজঙ্গ মাইতির গুদামে ঢোকে। ক্রেতারাও ট্যাং ট্যাং করে থলি ঝুলিয়ে হেঁটে আসেন না। মটোর সাইকেল, স্কুটার, স্কুটি থেকে সারসার গাড়িতে ছায়লা। বাতানুকুল সারিসারি ঘরগুলোয় ঢুকে পালং, পুদিনা, শসা, গাজর, পটল, কুমড়ো থেকে থোর-মোচা, ডিম-চিকেন-রেডমিট-সবকিছু বাড়ি নিয়ে যায়। মাঝে মাঝে ক্রেতাদের মধ্যে থেকে লটারি হয়। বিজেতাদের সিঙ্গাপুর, পাটায়া ও ব্যাঙ্ককে ইকো - ট্যুরিজমে ঘুরিয়ে আনা হয়।

এখনি ফেরুলে বাজারে হীনমন্যভাবে হেঁটে হেঁটে ঢুকছি। পুরনো পরিচিত এক কাঠের ভ্যানআলা বল্লে, যান, দেখে আসু গা!

—কোথায় রে? কাকে? লোকটা শুনে বল্লে, ভুজু মাইতিকে।

—কেন? কি হল তার? লোকটা বিড়ি টানতে টানতে দৃষ্টি ছোট করে বল্লে, শরীল খারাপ!

থাইতো! খেয়াল পড়ল আশপাশে অনেকদিন ভুজঙ্গ মাইতির পায়ের ধুলো পড়ছে না। ভেবেছিলাম অমন ব্যস্ত মানুষ, দেশের নদীনালা, পাহাড় জঙ্গল খনির ডাক নিচ্ছেন যিনি, ফেরুলের বাজার তো সাগরের বিন্দুজল।

আজ যাব কাল যাব করে বোঁদাইতে পা রাখা হয় না। নানা বাধা হাজির হয়। ঝাঁকে ঝাঁকে ভাদুরে বৃষ্টির উৎপাত, নয়তো অশ্বিনের চড়া রোদ এমন, পাটের খেতের সবুজ অবধি দাউ দাউ জ্বলতে থাকে। মাঠের ব্যাঙগুলো অবধি রোদের ভয়ে সাপের মুখে যেতে চায় না। মাঝে মাঝে সংবাদে শুনি, সাগরের তলায় গ্যাসের সন্ধান যে মিলেছে, সরকারের সঙ্গে ভুজঙ্গ তার দর কশতে গেছেন।

এক সন্ধ্যায় অবশেষে নানা কায়দায় পাড়ি দিয়ে ভুজঙ্গ মাইতির উঠোনে হাজির হলাম। দেখলাম, চামচিকে-ওড়া সন্ধ্যায় মাদুর পেতে দেয়ালে হেলান দিয়ে মাইতিকে বসিয়ে রাখা হয়েছে, সারাদিন ঘরেই শোয়ানো ছিল। ছোট মেয়েটা শুশ্রুষার জন্য শ্বশুরবাড়ি থেকে এসেছে। হাসিখুশি বেশ গোলগাল মুখ। একটুকুরো বিস্কুট চায়ে ভিজিয়ে বাপের মুখে ঠেলে ঢুকিয়ে দিচ্ছিল। নিতে পারছে না। আচ্ছন্নের মতো চোখ বুজে আছে। বউ এসে কানের কাছে চ্যাঁচালো, দ্যাকো তোমার বাজারের নোক এয়েচে! আমার উদ্দেশে হেসে বল্লে, দেখবেন এবার চাঙ্গা হবে! ফের ডাকল সে। কথাগুলো ভুজঙ্গের কানে ঢুকল না। পাশে আমার বসার বন্দোবস্ত হল। দুর্গন্ধ আসছিল। একবার চোখের ঢাকনাদুটো, আমাকে দেখে ফের ঝিমি মেরে রইল। টের পেলাম চিনতে পারেনি সাদা ফ্যাটফ্যাটে চোখের দলাদুটি সবকিছুর হাল যেন ছেড়ে দিয়েছে। মুখের হাড়গুলো মনে হল সম্পূর্ণ নিরস। ক্ষুধার কোন অনুভূতি নেই। নাকের ডগাটা লম্বা জুলে ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। মেয়েটি চপলতায় বল্ল, খিদে একদম নেই। বল্লাম, কী খায়? ভাত না রুটি? না! না! মেয়েটি বলে হল্লিক্স্ দিতে চাই, তাও নিতে পারে না।...এট্রু ফ্রুটি দিলে মুখে তোলে। বউ স্বাভাবিক ভদ্রতায় বলে, পরশু অবধি মানুষ চিনেছে...দু দিন হল বেশি কাহিল...পায়খানা-পেচ্ছাব কাপড়ে সারছে! দেখলাম উঁচু হাঁটু অবধি দুর্গন্ধময় কাপড়ে ঢাকা। মেয়েটি আস্তে বলে, কয়েকদিন ধরে জন্ডিস দেখা দিয়েচে! আমি চুপচাপ ভুজঙ্গর মুখে তাকিয়ে থাকি। ভেতরে কু গাইল। মরণ যেন শরীরের খোলটায় গোলগোল চোখে তাকিয়ে আছে। স্পষ্ট ছাপ। সেটা কেমন? যুক্তি দিয়ে আমিই প্রশ্ন করলাম আমাকে। উত্তর পেলাম না। বউ ফের হেসে বলে, দ্যাকো! কে এয়েচে! ভুজঙ্গ ফের চোখ খুলল। জীবন্ত পরিচয়ের ছায়া সেখানে ধরা দিল না।

বেরিয়ে, উঠোনটুকু এগিয়ে দিয়ে মেয়েটি ঝলমলে চাউনিতেই বলল, বাঁচবে না! লিভারে ক্যানসা...ডাগদারবাবু জবাব দিয়ে দিয়েছে!

পরদিন ফেরুলে বাজারে পুরনো কয়েকজনকে জানালাম, দেখে এসো ভাই!...তিন চার দিনের বেশি আর নেই ভুজঙ্গ মাইতি।..বড়জোর হপ্তাখানেক।

অনেকেই আমার নিদান দেয়াটা নিল না। পরের পর দিন দু-চারজন পুরনো মানুষ দেখে এসে জানাল, আমাদের চিনতে পেরেচে কিন্তু!...হাত তুলে নমস্কারও করেচে!

জবাব না দিয়ে আমতা আমতা করলাম। ঠিক চার দিনের মাথায় বাজারে গিয়ে শুনলাম, আজ ভোর ছ'টায় ভুজঙ্গ মারা গেছে। নিজের নিদান প্রতিধ্বনি করল, তুমি চন্ডালের মন্ত্র জেনে গেছ!

বিষন্ন বোধ হল। আমি কি মৃত্যুর সব দেয়াললিখন পড়ার মন্ত্র জেনেছি? পোড়া চোখদুটো দিয়ে? ভূমি, জল, নদী, পর্বত, ধাতু, বলি রাজার পাতাল দেশের সম্পদ—সবকিছুই চোখের সামনে ভাসতে থাকল। তখনই আৎকে উঠলাম। কোনো ছায়া ফুটে উঠছে কি! কেন, কে জানে!

সম্পাদক মশায়, শেষ লাইন ক'টা টাটকা ভোরের খবর পেয়ে লিখলাম। চিঠিটা সম্পূর্ণ হল। এবার শারদের গল্প ভালো না ঠেকলে, চিঠিটি ছাপিয়ে দিলেই সম্পর্ক অটুট থাকবে।

ইতি, আপনার!